গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২৩ জানুয়ারি ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিজেপি কংগ্রেসের ভোটের তরজায় না ভুলে

জীবনের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন জনগণকেই তুলতে হবে

নির্বাচনের দিন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি, কিন্তু কংগ্রেস ও বিজেপির ভোটের তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে বিদেশিনী বলে বরাবরের মত এবারও প্রচার করছে বিজেপি। এরই সাথে এবার তারা কতগুলি নতুন বিষয় এনেছে। তাহল, সোনিয়ার ডিপ্লোমা অবৈধ বা জাল। এরই প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসমহল বাজপেয়ীকে ভণ্ড এবং অসৎ বলে পাল্টা বিষোদ্‌গারও শুরু করে দিয়েছে। তারাও, বাজপেয়ীর পালিত কন্যা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজের নানা কুকীর্তি এবং বিজেপি নেতা ও সাংসদ প্রমোদ মহাজনের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অপবাদকে হাতিয়ার করতে চলেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ছাড়া তাদের কি কিছু বলার নেই? লোকসভা নির্বাচনে নীতিগত প্রশ্নে তাদের কি কোন বিরোধ নেই?

কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যেকার এই আপাতবিরোধ আসলে অবস্থানগত। ক্ষমতার মসনদে যখন কংগ্রেস ছিল, আর বিজেপি ছিল বিরোধী আসনে তখন কংগ্রেসের যে ইস্যুগুলির বিরোধিতা বিজেপি করত, আজ ক্ষমতায় বসে তারা সেগুলিই কার্যকরী করছে। ১৯৯১ সালে কংগ্রেসের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ যে 'উদার অর্থনীতি' আমদানি করেছিলেন, বিজেপি তাকেই আরও বৃহত্তর মাত্রায় অনুসরণ করছে। কংগ্রেস অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বেসরকারীকরণ বিলগ্নীকরণের নীতি নিয়েছিল, বিজেপি আজ সেই নীতিই কার্যকর করছে। মন্ত্রীসভায় বিলগ্নীকরণ দপ্তর বলে একটি দপ্তরও খুলেছে। ফলে এই অর্থনীতির পরিণামে তীব্র বেকার সমস্যা, কর্ম ও কর্মী সঙ্কোচন, সরকারি সম্পত্তি জলের দরে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর কাছে বেচে দেওয়া — এসব কোন প্রশ্নেই কংগ্রেস, বিজেপির বিরোধিতা করে না। শিক্ষানীতির প্রশ্নে ১৯৮৬ সালের রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিই বিজেপি সরকার অনুসরণ করছে। শিক্ষার গৈরিকীকরণ, বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ প্রভৃতি আজ বিজেপি যা করছে জাতীয় শিক্ষানীতি '৮৬তে তারই ইঙ্গিত ছিল। বিদেশনীতির প্রশ্নে উভয় দলই মার্কিন ঘেঁষা, কেউ সরাসরি, কেউ রেখে ঢেকে। উভয় দলই নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলে চূড়ান্তভাবে জনবিরোধী কার্যকলাপ করছে। ফলে জনজীবনের সমস্যা সমাধানে উভয় দলই ব্যর্থ। এই কারণে এরা একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ আনলেও তারা কেন ব্যর্থ হল, তাদের শাসন কোন্ শ্রেণীকে সুবিধা করে দিল — এই সমস্ত মূল বিচারে তারা যায় না। কারণ তাতে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে। তাই, উভয় দলই ব্যস্ত বিরুদ্ধপক্ষের শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনীর বর্ণনায়।

এতে তাদের লাভই হয়। প্রথমত এভাবে তারা জনসাধারণের দৃষ্টিকে এই তরজার লড়াইয়ে আটকে রাখে। নির্বাচন মানেই একে অপরকে গালমন্দ করবে, কুৎসা ছড়াবে — এই চিন্তার মধ্যেই তাদের ফাঁসিয়ে রাখে। ইলেকশান মানে পাঁচ বছরের জন্য শাসন ক্ষমতা কোন্ দল বা জোটের হাতে ন্যস্ত থাকবে তা ঠিক করা। সুতরাং কার শাসন জনসাধারণের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি কতটুকু সমাধান করবে বা আদৌ করবে কিনা এসব প্রশ্ন গুরুত্ব দিয়ে ভাবার বিষয়টি ভুলিয়ে দেওয়াও বুর্জোয়া দলগুলির এক কৌশল। কেন স্বাধীনতার ৫৫/৫৬ বছর পার হওয়া সত্ত্বেও বেকার সমস্যা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হল না, কেন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি আজও অপূরিত রয়ে গেল, কেন কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করে, শ্রমিক হাড়ভাঙা খাটলেও কোন আন্দোলন ছাড়াই কেন কারখানা বন্ধ হয়, চাকরি যায় — এসব প্রশ্ন চাপা দিতেই বুর্জোয়া দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। জনসাধারণের সমস্যায় বুর্জোয়া দলগুলি এবং বিভিন্ন সরকার যে মোটেই চিন্তিত নয়, ভাবিত নয় সেই দিকটি আড়াল করে এর মধ্য দিয়ে। নির্বাচনে জনসাধারণকেই তাই জীবনের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে।

জীবনকালীন কর চাপানোর প্রতিবাদে

মোটর সাইকেল মিছিল করতে দিলনা পুলিশ

পুলিশ কলকাতায় মোটর সাইকেল র‍্যালি করতে দিল না। মোটর সাইকেল ও স্কুটারের উপর রাজ্য সরকারের কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক থেকে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত এই মিছিলের কর্মসূচি ছিল। কিন্তু পুলিশ মিছিল করতে দিল না। গত কয়েকদিন ধরে এই করবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছিল। চলছিল কোর্টে আইনি লড়াই। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনকে এক সূত্রে গেঁথে ১৮ জানুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল টু-হুইলার্স ওনার্সদের সারা বাংলা কনভেনশন। গঠিত হল টু-হুইলার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু

চারের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি

মালিক যতই অনাহারে মারুক শ্রমিক আন্দোলন করতে পারবে না

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের শ্রমিকরা যে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে তার সমাধানে আমাদের দল এস ইউ সি আই এবং শ্রমিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন যে আন্দোলন করে আসছে এবং পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে দাবি সনদ তুলে ধরেছে তা যে কতটা বাস্তবসম্মত ছিল সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের সুপারিশ এবং রাজ্য সরকারি কমিটির সুপারিশ তা দেখিয়ে দিল। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলাম, চা-বাগানের সঙ্কটের জন্য মালিকই দায়ী। মাসের পর মাস রেশন না দিয়ে, বোনাস না দিয়ে, পি এফের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে এবং সর্বোপরি চা বাগানে লক আউট করে, বাগান বন্ধ করে দিয়ে ৪০/৫০ হাজার

ছয়ের পাতায় দেখুন

চা-বাগানে মৃত্যু

পরাধীন ভারতে অনাহারে কেউ মারা গেলে ব্রিটিশরা বলত অনাহারে মৃত্যু হয়নি। কংগ্রেস সরকার বলত অনাহারে মরেনি, অপুষ্টিতে মরেছে। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে একজন শ্রমিকও অনাহারে মারা যায়নি। মারা গেছে অসুখ-বিসুখে। অথচ একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত অনুরাধা তলোয়ারের তদন্ত রিপোর্ট দেখাচ্ছে, সবকটি চা-বাগান মিলিয়ে ১০০০-এরও বেশি মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মারা গিয়েছেন। হাসপাতালের রেকর্ড ঘেঁটে এবং চা-বাগানের সঙ্কট শুরুর পূর্ববর্তী বছরগুলির গড় মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করে এবং বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালিয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান লব্ধ রিপোর্ট ১৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছেন। (বর্তমান ১৯-১-০৪)

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে **দ্বিতীয় সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন**

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২৮ জানুয়ারি ২০০৪ বালিযাত্রা ময়দান, কটক, ওড়িশা / প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ২৯-৩০ জানুয়ারি ২০০৪

মদের লাইসেন্সের বিরুদ্ধে কনভেনশন

রাজ্যে ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া ও হালকা মদের নামে সর্বত্র প্রকাশ্যে মদ বিক্রির প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন পশ্চিম বেহালার মানুষ। ১১ জানুয়ারি এক নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়ে ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী সহ ৩০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক প্রচারপত্র নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক প্রচার চালায় এলাকার ডি ওয়াই ও যুবকর্মীরা। এলাকার বাজার, জনবহুল স্থানসহ সর্বত্র এ নিয়ে চলে প্রচার, স্বাক্ষর সংগ্রহ। সর্বত্র মানুষ গভীর আগ্রহে এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, স্বাক্ষর দিয়েছেন। কিশোর ভারতী স্কুলে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি সি সান্যাল রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মদ খেলে মানুষ শুভবুদ্ধি হারায়, অশুভশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি বলেন, এমনিতেই সমাজে নানান ধরনের অপরাধ বাড়ছে, এর উপর যদি সরকার আরও মদের দোকানের লাইসেন্স দেয় তবে সমাজ জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তিনি মদের শারীরিক কুফল সম্পর্কে বলেন, এর ফলে টি বি, গ্যাসট্রিক আলসার, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার সহ বহু রোগ সৃষ্টি হয়। মূলত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষই বেশি এর কবলে পড়ে। শিক্ষক অমিয় কুমার জানা বলেন, আমার লজ্জা হয় যে, সি পি আই (এম) দলের জন্য একসময়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি। তিনি বলেন, এই সরকার দেশের সাধারণ মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক নারায়ণ চক্রবর্তী, ডি ওয়াই ও'র পক্ষে রাজ্য কমিটির সদস্য পিণ্টু প্রতিহার ও অন্যান্যরা। কনভেনশন থেকে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং এলাকায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক বিকাশ ভট্টাচার্য।

রিক্সা ও ভ্যানচালক সম্মেলন

সমস্ত রিক্সাচালকদের লাইসেন্স দেওয়া, সরকারের স্বীকৃত শ্রমিকদের অধিকারটুকু সুনিশ্চিত করা, ই-এস-আই স্কীমে চিকিৎসার সুযোগ, পেনশন ও বীমা চালু এবং পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে ১৩ জানুয়ারি দক্ষিণ শহরতলি রিক্সা ও ভ্যানচালক ইউনিয়নের ১ম সম্মেলন বেহালার বীণা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক রিক্সাচালক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি (এল এস) এর নেতা কমরেডস্ বিধান চ্যাটার্জী, দীপক দেব, জুট আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড তিমিরবরণ ঘোষ, ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বিজন হাজরা ও রিক্সাচালক প্রতিনিধিবৃন্দ।

এই সম্মেলনে রিক্সা ও ভ্যানচালকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সমর্থন লক্ষ্য করে সি আই টি ইউ কর্মীরা রিক্সাচালকদের মারধোর করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় যাতে সম্মেলন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রিক্সাচালকদের দৃঢ়তা ও ব্যাপক অংশগ্রহণ তা ব্যর্থ করে দেয়। সম্মেলন শেষে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিল করে বেহালা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আগামী ২৮ জানুয়ারি রিক্সার লাইসেন্সের দাবিতে কলকাতা কর্পোরেশন অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

ঝাড়খণ্ডে

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নতুন বছরের প্রথম দিনেই ঝাড়খণ্ড রাজ্য 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাল। অথচ বিজেপি'র নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ডে এন ডি এ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে না। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেন, 'গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা যারা নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দেয় তাদের উপর বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য চাপিয়ে দেওয়া হল। অথচ যারা কোটি কোটি টাকা বিদ্যুতের বিল বাকি রাখে সেই শিল্পপতিদের বিদ্যুতের দাম কমিয়ে দেওয়া হলো। এই জনবিরোধী পদক্ষেপের নাম কি 'রামরাজ্য' এবং 'সুরাজ' প্রতিষ্ঠা?

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দলের উদ্যোগে রাজ্যের রাজধানী রাঁচিতে বিক্ষোভ সমাবেশে বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। কুশপুত্তলিকায় অগ্নি সংযোগ করেন কমরেড সরলা মাহাতো। জামসেদপুরের সাকচি গোলচক্কর ও ঘাটশিলায় প্রতিবাদ সভা এবং বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এইসব বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস অশোক সিং, লিলি দাশ, সুজিত রায় এবং রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সীতারাম টুডু। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবি জানান হয়। পরবর্তী ধাপে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ধরনা, সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে

শিক্ষা কনভেনশন

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, তহবিল তছরূপ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, জালমার্কসীট চক্র, ক্ষমতাসীন দলের নগ্ন দলবাজী, দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাস, জুলুম, অত্যাচার, ছাত্র পীড়ন, করেসপন্ডেন্স কোর্সের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা লুঠ প্রভৃতির প্রতিবাদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে ১১ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর হলে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কেন্দ্রীয় শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী সহ সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কনভেনশনের সভানেত্রী ডঃ সুশীলা মণ্ডল বলেন, বিদ্যাসাগরের মত প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান যা দুর্নীতি ও পঠন-পাঠনের অবস্থা তাতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হচ্ছে এবং হবে। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় — এই ননট্র্যাডিশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বাংলা সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার মেদিনীপুর জেলার ৩১টি কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনেছে। প্রয়াত শিক্ষাবিদ পাঁচকড়ি দে, প্রয়াত বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত, ডঃ সুশীলা মণ্ডল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ১৯৮১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্র্যাডিশনাল সাবজেক্ট-এ মাস্টার ডিগ্রী চালু হয়।

কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অধ্যাপক দেবাশিস আইচ। অল ইণ্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক তপন রায়চৌধুরী এবং ছাত্রনেতা কমল সাঁই।

সমস্ত বক্তাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংসকারী শাসকদলের দলবাজী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান। কনভেনশনে ডঃ সুশীলা মণ্ডলকে সভানেত্রী, জেলার শিক্ষক আন্দোলনের নেতা দিলীপ মাইতিকে সম্পাদক, কমল সাঁইকে অফিস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করে ৮০ জনের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দুই মেদিনীপুর জেলার শিক্ষানুরাগীদের গণস্বাক্ষর নিয়ে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে।

কনভেনশনে উপস্থিত শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ

ডি এস ও'র বীরভূম জেলা সম্মেলন

শিক্ষায় ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ রুখতে ১০-১১ জানুয়ারি বীরভূম জেলা ছাত্র সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হলো বোলপুর শহরে।

১০ জানুয়ারি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ জেলার অধিকাংশ কলেজ এবং ৫০টি বিদ্যালয় থেকে আসা সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর আবেগদৃপ্ত সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে বোলপুর হাইস্কুল মাঠে এসে সমবেত হয়। মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠের সোচ্চার ধ্বনিতে দাবি ওঠে 'শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি করা চলবে না', 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে', 'শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা চলবে না', 'মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে ছাত্র-যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া চলবে না।' প্রাণবন্ত সুশৃঙ্খল মিছিল শহরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বীরভূম জেলার অন্যতম নেতা কমরেড রতন মুখার্জী, ডি এস ও'র পূর্বতন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং বর্তমান রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান।

১১ জানুয়ারি প্রতিনিধি সম্মেলনে ২০৪ জন প্রতিনিধি অংশ নেয়।

সম্মেলন থেকে কমরেডস্ বিজয় দলুইকে সভাপতি এবং আয়েষা খাতুনকে সম্পাদিকা করে ১৮ জনের জেলা কমিটি ও ৪০ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন নবনির্বাচিত জেলা সম্পাদিকা কমরেড আয়েষা খাতুন

লিংডো সত্য বলেছেন তবে তাঁর দৃষ্টি সীমিত

ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জে এম লিংডো সম্প্রতি বিবিসি ওয়ার্ল্ডের 'হার্ডটক ইণ্ডিয়া' অনুষ্ঠানে করণ থাপারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিছু কড়া মন্তব্য করে এদেশের বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের কুশীলবদের বেশ বিব্রত করে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনীতিকরা ক্যান্সারের মত, যা দেশের রাজনীতি জগতকে বিষিয়ে তুলছে এবং এই মুহূর্তে তা সারবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এদের কারোরই গণতন্ত্রের প্রতি কোন দায়দায়িত্ববোধ নেই। কারণ, তাঁর মতে, গণতন্ত্র মানে শুধু একটা নির্বাচন প্রক্রিয়াই নয়, গণতন্ত্রের মূল কথা হল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে যতদূর সম্ভব মর্যাদা দেওয়া। লিংডোর অভিমত, তাঁর চারপাশে এমন কাউকে দেখছেন না যিনি বা যাঁরা তা করেন। বরং রাজনীতিবিদদের মধ্যে খুব অল্পজনকেই পাওয়া যাবে যাদের সঙ্গে মানুষ হিসাবে সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়। হয় এরা অত্যন্ত নাকউঁচু, অথবা অন্য কারোর পায়ে পড়ে রয়েছে। সরকারি ক্ষমতায় বসতে পারা মানে, এরা মনে করে যে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য জমিদারি পাওয়া ; অতএব এর মধ্যে যা পারা যায় করে নেওয়া দরকার। লিংডো এখানেই থেমে থাকেননি। ভারতে একটা চমৎকার গণতন্ত্র চালু রয়েছে — এই ধারণাকে নস্যাৎ করে, এইভাবে ভাবাকে তিনি আত্মতুষ্টিতে ভোগা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সত্যি কথাটা বলার সময় হয়ে গিয়েছে। সকলেই এইসব রাজনীতিক-দের তোষামোদ করে চলেছে। কিন্তু তারা নিজেদের যত সুন্দর মনে করে আসলে তাঁরা যে তা নন — এ কথাটা কারোর বলা দরকার।

সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে যতটুকু যা প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বলা যায় যে, লিংডোর এইসব তির্যক মন্তব্যের প্রধানত দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। দুই ধরনের প্রতিক্রিয়ার প্রবক্তারাই মোটামুটি মেনে নিচ্ছে লিংডোর কথাগুলো ঠিক। বেশিরভাগ প্রচারমাধ্যম — বৈদ্যুতিন বা খবরের কাগজ, এ প্রসঙ্গে একদম চুপ করে রয়েছে। ভাবখানা, ''কী দরকার এ নিয়ে হৈ চৈ করে; অন্যথায় আরও কোত্থেকে কী বেরিয়ে পড়বে।'' অন্যদিকে দি হিন্দু বা টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার মতো কিছু খবরের কাগজ জনমত সমীক্ষার মতো করে বা প্রবন্ধ ছাপিয়ে দু'চারটে অভিমত তুলে ধরেছে। তারা দেখাতে চেয়েছে যে কেউ বলছে লিংডো অমন মাঝে মাঝে একটু কড়া কথা বলে লোকজনকে চটিয়ে দেন (যেমন গুজরাটে বিজেপিকে আর মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে চটিয়েছেন)। কারোর মতে লিংডো বাড়াবাড়ি করেছেন। তাঁর এক্তিয়ারই নেই এভাবে সমস্ত রাজনীতিকদের গালমন্দ করার। কেউ বলছেন যে হ্যাঁ, দুর্নীতি আছে, তবে রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে তো চলবে না। বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনাকে কেমন করে শক্তিশালী করতে পারলে রাজনীতিকরা বশে থাকে অর্থাৎ ঠিকঠিক ব্যবহার করে — তার কথা ভাবলে ভাল হয় না? আর একদল মানুষ খুঁজে পেতে দেখিয়েছেন, কোন্ দলে কোন্ ভাল নেতা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন বা কার পাশের গ্রামে কিছু মানবপ্রেমী লোকজন জনহিতকর অনেক কাজ করছেন। অতএব, তাঁদের মতে সৎ লোকজনদের এগিয়ে এসে এইসব দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের হটাতে হবে। অন্তত একটি ক্ষেত্রে (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৭ জানুয়ারি) এক প্রবন্ধের লেখক তাঁর গোটা লেখায় নানা কথা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, লিংডো রাজনীতিকদের ক্যান্সার বলে ভুল করেছেন। বলা উচিত ছিল পরগাছা। তার কারণ যে গাছে পরগাছা থাকে তা পরগাছাকে সহ্য করে নেয়। যেমন আমাদের সমাজ এইসব রাজনীতিকদের মেনে নিয়েছে।

এদেশের সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের মেনে নেয় ঠিকই, তবে তা মূলত সমাজের সেই অংশ যারা কোনও না কোনওভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের থেকে লাভ কুড়োচ্ছে। বাকিরা মানতে বাধ্য হয়, বিকল্প না পেয়ে। দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু আজ প্রায় প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছেন, এদেশের বেশিরভাগ রাজনীতিকরা এবং রাজনীতির জগতে, বিশেষ করে, ক্ষমতার কাছাকাছি দলগুলি (এদের কেউ আজ ক্ষমতায়, কাল বিরোধীপক্ষে; আর তার পাশাপাশি অন্য আর এক দল আজ বিরোধী পক্ষে, কাল গদিতে আসীন) কী ধরনের কদর্য দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে। তাঁরা এও দেখছেন যে, দুর্নীতির প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাজনীতিকরা যে মুখে বিশেষ একটি দুর্নীতির সমালোচনা করছেন, সেই একই মুখে অপর একটি দুর্নীতির পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর মতো রাজনীতিক অজিত যোগী, জুদেও-এর সমালোচনা করে আক্ষেপ করেন, দেশের যুবকরা এদের থেকে কী শিখবে। আবার এই প্রধানমন্ত্রীর কাছে শাসকদল ও মাফিয়াদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সত্যেন্দ্র দুবেকে মাফিয়াদের হাতে খুন হতে হয়; তার নাম ফাঁস হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহই থাকে না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্নটা অন্য। তাঁদের প্রশ্ন — এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কী করে?

বিষয়টা হল, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা তাদের গণতন্ত্রকে পবিত্র, অবাধ, স্বাধীন ইত্যাদি যা কিছু বলে যত দাবিই করুক না কেন পুঁজিবাদের একেবারে প্রথম যুগে যতটা গণতন্ত্রের চর্চা বুর্জোয়ারা করেছে, পুঁজিবাদ যত সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, তত গণতন্ত্রের পরিবর্তে বেশি বেশি করে ব্যুরোক্রেসি ও মিলিটারির ওপর নির্ভরশীল হয়েছে এবং দুর্নীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণী মুনাফার স্বার্থেই দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। ব্যক্তিগত সততা থেকে গিয়েছে বিরল ব্যতিক্রমের মতো।

আর আজ? এদেশের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। যে দেশ সারা পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পাঠ শেখানোর দায়িত্বের কথা ঘোষণা করে আজ ইরাক, কাল আফগানিস্তান বা যুগোশ্লাভিয়ায় মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে সমস্ত রীতিনীতি, জনমত অগ্রাহ্য করে আক্রমণ করছে — সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশ-এর জয় যে টাকার খেলা আর কারচুপির মাধ্যমেই ঘটেছিল — এ কথা ত সারা পৃথিবী জানে। আবার সংসদীয় গণতন্ত্রের দুই ধ্বজাধারী আমেরিকা ও ব্রিটেনের গণতন্ত্রের এমনই মহিমা যে, দুই দেশেই সংসদের অভ্যন্তরে সরকারি ও বিরোধী দু'পক্ষ মিলিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদরা সম্পূর্ণ ভূয়ো, সাজানো এক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাত খাড়া করে ইরাকের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে সেদেশের নারী-শিশু সহ নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করার সিদ্ধান্তকে 'গণতান্ত্রিক' পথে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করে না! মহামান্য সাংসদদের আর্থিক বা যৌন কেলেঙ্কারির খবর আজ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দুনিয়ার নানা দেশ থেকেই বেরিয়ে আসে!

প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মতো তারই অঙ্গ বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা আজ ঐতিহাসিকভাবেই পুরোপুরি নিঃশেষিত। তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট আজ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে, যার সম্পূর্ণ বোঝাটা শাসকদলগুলি জনগণের উপর চাপাচ্ছে। চূড়ান্ত সঙ্কটে জর্জরিত সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ যাতে হাতের বাইরে না চলে যায়, সমাজ তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাতে পুঁজিপতিদের হাতেই থাকে — এই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই এদেশের পুঁজিপতিরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে রাজনীতির রাশটা যেন এমন শক্তি, এমন দলের, এমন রাজনীতিকদের হাতে থাকে যারা তাদেরই সেবা করবে, তাদেরই স্বার্থ দেখবে। তারা দেখবে অর্থনৈতিক সঙ্কট যে পর্যায়েই পৌঁছাক না কেন, পুঁজিপতিদের মুনাফা যেন কোনোমতেই না কমে, বরং বাড়ে; রাজনৈতিক সঙ্কট, খেয়োখেয়ি কামড়াকামড়ি যাই হোক না কেন, শাসন ব্যবস্থাটা যেন বজায় থাকে — যতদিন পারা যাচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাটবাট বজায় রেখে, নাহলে অন্যকোনভাবে। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে এই কাজটা করার জন্য রাজনীতিকরা অধঃপতিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ এখন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। অধঃপতন-ক্ষয়-দুর্নীতি এখন তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে দেশের উন্নয়ন, অর্থনীতির দ্রুত অবাধ অগ্রগতি কোনটাই আর সম্ভব নয়। ফলে যেভাবেই হোক সরকারি গদিতে বসার জন্য এবং বসার পর, এইসব রাজনীবিদদের কাজ হল শোষক বুর্জোয়াশ্রেণীকে খুশি করে ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর যারা বিরোধীপক্ষে, তাদের লক্ষ্য যে কোন উপায়ে মালিকশ্রেণীর দাক্ষিণ্যে সরকারি গদিতে বসা। অথচ চূড়ান্ত অস্থির, অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কে কতদিন গদিতে থাকতে পারবে — তার কোন ঠিক নেই। অতএব গদিতে থাকতে থাকতে যে যেখানে রয়েছে, যার যতটুকু ক্ষমতা আছে প্রয়োগ করে কীভাবে নিজের আখেরটুকু গুছিয়ে নেওয়া যায় — এই চিন্তাই আজ সংসদীয় গণতন্ত্রের অলিন্দে ক্ষমতার কাছাকাছি প্রতিটি দল বা রাজনীতিককে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দুর্নীতির দ্বারা তারা যেমন নিজের আখের গোছাচ্ছে, তেমন সাধারণভাবে মালিকশ্রেণী এবং বিশেষভাবে যে মালিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে তারা সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, নীতি বদলাচ্ছে, কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে বা ঐ ধরনের নানা কায়দায় টাকা পাইয়ে দিচ্ছে। এই দুর্নীতি, স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোলুপতা, উন্নাসিকতা বা ক্লীবত্ব — যার কথাই লিংডো বলে থাকুন বা ভেবে থাকুন না কেন — এ কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিষয় নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হেরফের ঘটলেও, এই দুর্নীতি, 'ক্যান্সারের' মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা গোটা সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই অনেকের মনে হতে পারে সমাজ বোধহয় রাজনীতিতে দুর্নীতিকে মেনে নিয়েছে।

আবার লিংডোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা সমাজের সৎ মানুষদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা বলছেন, তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, একবার রাজনীতির আবর্তে এসে যাওয়ার পর সৎ মানুষও শেষপর্যন্ত এই অবস্থার শিকার হয়ে পড়ে অথবা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়। সমাজব্যবস্থা তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের পচনটাকে দেখতে বা দেখাতে না চেয়ে কেউ কেউ বলতে চান যে ভিন্ন মত থাকলেও সৎ মানুষকেও তো দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। তাই তার কিছু করার থাকে না। কিন্তু এই কথা বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। যেখানে শিল্পপতি-পুঁজিপতি-আমলা, সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকরা, মায় সেনা-অফিসাররা দুর্নীতির পাঁকে আয়েস করে ডুব দিয়ে বসে আছে, গোটা সমাজব্যবস্থায় যেখানে পচন ধরেছে, সেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিকে বাগে আনা সম্ভব নয়। একমাত্র শক্তিশালী গণআন্দোলনের পথেই তাকে খানিকটা আটকানো যেতে পারে।

জনগণের নামে শপথ নিলেও এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র আসলে যেনতেন প্রকারেণ মুনাফা লোটার গণতন্ত্র। অথচ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কটের কারণে বুর্জোয়া অর্থে সৎ থেকে, আইনকানুন মেনে মুনাফা লোটার রাস্তাও খুবই সঙ্কীর্ণ। বিশ্বজোড়া তীব্র মন্দা, অনিরসনীয় বাজার সঙ্কটে জর্জরিত গণতন্ত্রের গায়ে হাত দিলেই সততার পলেস্তারা খসে পড়ছে।

নির্বাচনী সংস্কারের নামেও যতটুকু মেরামত করা হচ্ছে তাতে সমস্ত প্রক্রিয়াটা বুর্জোয়াদের বংশবদ বা আস্থাভাজন ডান বা বাম, সব রঙের বৃহৎ সংসদীয় দলগুলিরই কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে। গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের কথা নিয়ে সত্যিই ভাবে এমন রাজনৈতিক শক্তি বা দলের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটাই দুরূহ হয়ে পড়ছে। ব্রিটেন আমেরিকায় এটা আগেই হয়েছে, এখন এদেশেও হচ্ছে। ফলে দুর্নীতিকে রুবে কে ?

একজন উচ্চপদস্থ আমলা হয়েও লিংডো যেভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিকদের আসল চেহারাকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন, সচরাচর তা ঘটে না। কিন্তু তাঁর এই কথাগুলির কোন দামই থাকবে না, যদি আমরা দুর্নীতির মূল উৎসটাকে চিহ্নিত করতে না পারি, যদি না আমরা বুঝতে পারি যে পুঁজিবাদকে অটুট রেখে এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই পেতে পারি না। সেইসঙ্গে ক্রমশ প্রমাণ হচ্ছে আর একটা জ্বলন্ত সত্য। পুঁজিবাদী কোন দেশে আজ আদর্শ গণতন্ত্র বলে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত। বরং গণতন্ত্রের আদর্শ রূপ কি হতে পারে তার নিদর্শন তুলে ধরেছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ; সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ক্ষমতা করায়ত্ত করার আগে দীর্ঘ তিরিশ বছরের বেশি প্রথমে কমরেড লেনিন ও পরে কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া।

যে স্ট্যালিনকে স্বৈরাচারী একনায়ক না বলে বুর্জোয়া রাজনীতিকরা কথা বলেন না, সেই স্ট্যালিনের সোভিয়েট রাশিয়া সেখানকার মানুষকে শুধু ভোট দেওয়ার অধিকারই দেয়নি, কী কী কাজ করতে হবে, ভোটাররা প্রতিনিধিকে তার নির্দেশ দিতে পারত এবং প্রয়োজনে নিজেদের উদ্যোগে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনার অধিকার তাদের ছিল। ফলে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিকদের মত অন্তত একটা টার্ম-এর জমিদারি ভোগ করার উপায় ছিল না সে ব্যবস্থায়। বরং গণতন্ত্রের সেই প্রকৃত প্রসারিত চেহারায় জনগণের ভূমিকা কি ছিল — তার এক ঝলক ছবি ফুটে ওঠে আমেরিকান সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং-এর লেখায়। সেদিন সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান কীভাবে গৃহীত হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে গিয়ে

চারের পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ডে
ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডি এস ও'র আন্দোলন

ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে দশগুণ টিউশন ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ২ জানুয়ারি। এই মারাত্মক ফি বৃদ্ধির পরও সরকার বলছে, এদিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিদ্যুৎ, টেলিফোন বা বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্সের টাকার সংস্থান আরও বাড়াতে হবে।

এর প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি রাজ্যজুড়ে প্রচার ও প্রতিবাদ সভা করে। এক প্রেস বিবৃতিতে ডি এস ও' রাজ্য সম্পাদক বলেন, ভারতের মত জনকল্যাণমুখী বলে ঘোষিত একটি রাষ্ট্রের তো শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা উচিত। সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা উচিত। এক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।'

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচিতে ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করে মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়ায়। এখানে এক প্রতিবাদ সভা করা হয় ডি এস ও রাঁচি জেলা সভাপতি কমরেড স্বরূপ মণ্ডলের সভাপতিত্বে। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাঁচি জেলা সম্পাদক কমরেড রাজেশ রঞ্জন ও অফিস সম্পাদক কমরেড মিণ্টু পাশোয়ান। অনুরূপ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয় বোকারো, জামসেদপুর, ঘাটশিলাতেও। এইসব সভায় বক্তব্য রাখেন ডি এস ও'র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড মোহন সিংহ ও অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

পরবর্তী স্তরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন, ধরনা এবং ছাত্র ধর্মঘট সহ আরও জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সবজির দামবৃদ্ধি প্রসঙ্গে

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

''একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে জনগণের প্রকৃত আয় কমছে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের দাম বাড়ছে, অন্যদিকে এই অবস্থায় সকল সব্জির অত্যধিক দামবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে খুবই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ফেলেছে।

আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছি চাষীর কাছ থেকে ন্যায্য দামে কিনে এবং আড়তদারদের কাছ থেকে মজুত উদ্ধার করে নির্দিষ্ট সস্তা দরে সব্জি বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক। উক্ত দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।''

মিছিল করতে দিলনা পুলিশ

একের পাতার পর

পার্কের সামনে। এই প্রকাশ্য কনভেনশনের আহ্বায়ক শংকর ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, 'সরকার লাইফটাইম কর আদায় করছে। কার লাইফ ? মোটর সাইকেলের না তার মালিকের ? ১৫ বছরের এককালীন ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে, সরকার আবার কর দাবি করছে। এটা বেআইনি। এর প্রতিবাদেই এই কনভেনশন।' তিনি বলেন, 'এই রাজ্যে মোটর সাইকেলের মালিকরা পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিকেল কর আইন ১৯৭৯ অনুযায়ী বছর বছর কর দিতেন। রাজ্য সরকার ১৯৮৯ সালে এই আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এককালীন কর আইন চালু করে এবং তার পর থেকে দ্বি-চক্রযানের মালিকরা ১৫ বছরের ট্যাক্স সরকারের ঘরে অগ্রিম জমা দিয়ে মোটর সাইকেল বা স্কুটার কিনতেন। তখন বলা হয়েছিল, ১৫ বছরের মধ্যে মোটর সাইকেলের মালিকদের আর কোন কর দিতে হবে না। এখন রাজ্য সরকার এই আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবনকালীন কর প্রথা চালু করতে চাইছে এবং বলছে ২৫ নভেম্বর ১৯৯১ সালের পর যারা মোটর সাইকেল বা স্কুটার কিনেছে তাদেরই এই কর দিতে হবে। অর্থাৎ ১৫ বছরের অগ্রিম কর দেওয়ার পর আবার কর দিতে হবে এবং তা দিতে হবে বিশাল অঙ্কের টাকায়। এই নয়া ফরমান অন্যায়, বেআইনি এবং মোটর সাইকেল মালিকদের স্বার্থের পরিপন্থী।'

এদিনের কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট ভবেশ গাঙ্গুলি, প্রদীপ নন্দী (শিলিগুড়ি), জ্ঞানানন্দ রায় (মেদিনীপুর), বঙ্কিম বেরা (কলকাতা), জগদীশ সাউ (মেদিনীপুর), নুরুল আমিন (উত্তর ২৪ পরগণা) ও চন্ডীদাস ভট্টাচার্য। কনভেনশন থেকে ভবেশ গাঙ্গুলিকে উপদেষ্টা, বিজ্ঞান বেরাকে সভাপতি এবং শঙ্কর ঘোষকে সম্পাদক করে টু-হুইলার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশন শেষে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মোটর সাইকেল র‍্যালি করার কর্মসূচি ছিল। কিন্তু বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিল করতে না দেওয়ায় মোটর সাইকেল মালিকরা রাস্তার মধ্যে তাদের মোটর সাইকেল ও স্কুটার শুইয়ে দিয়ে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ করেন এবং সারা রাজ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। কমিটির দাবি ঃ

১। অবিলম্বে জীবনকালীন কর আইন বাতিল করতে হবে, ২। এই আইনবলে যে সমস্ত টু-হুইলার্স ওনার্সদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে সেই সমস্ত টাকা অবিলম্বে সুদসহ ফেরত দিতে হবে, ৩। টু-হুইলার্স ওনার্সদের উপর প্রশাসনিক জুলুম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, ৪। রাজ্যের সমস্ত রাস্তা মোটর সাইকেল চলার উপযুক্ত করতে হবে অন্যথায় রোড ট্যাক্স নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং ৫। পেট্রলের উপর উপসাগরীয় কর ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের সেস্ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

নদীয়া জেলা যুব সম্মেলন

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হল ২য় নদীয়া জেলা যুব সম্মেলন। ১০ জানুয়ারি পলাশি স্টেশন সংলগ্ন ঘোষপাড়া ময়দানের প্রকাশ্য সভায় সহস্রাধিক যুবক-যুবতীর সামনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড খোদা বক্স, এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য কমিটির সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী। গ্রামীণ জীবনের ওপর সরকার যেভাবে ক্রমাগত করের বোঝা চাপিয়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান কমরেড খোদা বক্স। কমরেড খাদিজা বানু বলেন, রাজ্য সরকার ঢালাও মদের লাইসেন্স দিয়ে যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে। তিনি এর বিরুদ্ধে যুব প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কমরেড রূপম চৌধুরী বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় গড়ে ওঠা ডি ওয়াই ও-ই একমাত্র যুবসমাজকে সংগঠিত করে ব্যাপক যুবআন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন কমরেডস্ জয়দীপ চৌধুরী ও জান্নাত আলি। সন্ধ্যায় স্থানীয় মীরা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সম্মেলনে কমরেডস্ জান্নাত আলিকে সভাপতি এবং জয়দীপ চৌধুরীকে সম্পাদক করে ৩৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জয়

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা গ্রুপ সাপ্লাইয়ের আধিকারিককে গত ১২ জানুয়ারি শত শত বিদ্যুৎ গ্রাহক ঘেরাও করে বাধ্য করল দাবি মেনে নিতে। খারাপ মিটারের ভাড়া আদায় বন্ধ, মিটারের দাম হিসাবে আদায় করা টাকা ফেরত, ভুতুড়ে বিল সংশোধন, যে কোন অজুহাতে লাইন কাটা বন্ধ, বিল কাউন্টারের সামনে আচ্ছাদন তৈরি প্রভৃতি ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে ওন্দা বাস স্ট্যান্ডে এক সমাবেশে গ্রাহকরা সমবেত হন।

সমাবেশ শেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দৃপ্ত মিছিল এস এস দপ্তরে পৌঁছলে সেখানে বিল জমা দিতে আসা গ্রাহকরাও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অনতিবিলম্বে ডেপুটেশন গ্রহণকারী এস এস বাঁকুড়ায় ডি-ই'র সাথে ফোনে পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে দাবিগুলি মেনে নেন।

এস এস-এর ঘোষণার পরে ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, আঞ্চলিক সম্পাদক জয়দেব কর, বলরাম দাস, অমরেন্দ্র পালিত, মনসা রাম সিংহ প্রমুখ।

ইতিপূর্বে প্রায় একই দাবিতে ৭ জানুয়ারি ঐ জেলার খাতড়া এ-ই অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। সেখানেও শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক জয়দেব করের নেতৃত্বে সমবেত হন। কয়েকজন গ্রাহকের বকেয়া বিলের অজুহাতে লালবাজার-মালিয়ানের এল-টি লাইনটিই কেটে দিয়েছিল পর্ষদ। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ লাইন জুড়ে দিতে বাধ্য হয়। গোপালপুরে প্রায় ৩ কিলোমিটার তার প্রশাসনের গাফিলতিতে চুরি হওয়ায় গ্রাহকরা ২৪ নভেম্বর থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। এদিনের ঘেরাও এর চাপে এ-ই সরাসরি মেদিনীপুর জোনাল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হন। তার সরবরাহ করার কথা জেড-এম ফোনে গ্রাহক সমিতির নেতৃত্বকে জানালে ঘেরাও প্রত্যাহৃত হয়।

প্রসঙ্গ লিংডো
আদর্শ গণতন্ত্রের নিদর্শন তুলে ধরেছিল সোভিয়েট সমাজতন্ত্র

তিনের পাতার পর

আনা লুই স্ট্রং তাঁর 'দি স্ট্যালিন এরা' বই-এ জানিয়েছিলেন ঃ ''সোভিয়েট জনগণ ... শুধু প্রার্থীদের ভোটই দেয়নি; তারা তাদের যা দাবি ছিল, সেগুলোকে 'নাবাজ' অর্থাৎ 'জনগণের নির্দেশ'-এ লিখে দিয়েছিল। যে সরকার তৈরি হয়েছিল — তার প্রথম কাজের বিষয় ছিল ঐ দাবিপত্রগুলি দেখা। ... কতজন ভোট দিতে আসছে শুধুমাত্র তা দিয়ে 'সোভিয়েট গণতন্ত্রের' বিচার করা হত না, যদিও এই সংখ্যাটা ১৯২৬-এ ভোটারের ৫১ শতাংশ থেকে ১৯৩৪-এ ৮৫ শতাংশে দাঁড়ায়। সরকারি কর্তব্যকর্মে তাকে সাহায্য করার জন্য একজন ডেপুটি কতজন স্বেচ্ছাসেবককে জড় করতে পারলেন সেইটে ছিল গণতন্ত্র বিচারের অন্যতম মাপকাঠি। ...ত্রিশের দশকের শেষদিকে মস্কোয় গিয়ে হাওয়ার্ড কে স্মিথ এই পরিবেশ দেখে বলেছিলেন, 'আপনার মনে হবে প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছিল — ভাবছিল তারা রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয় কাজ করছে। ...পরিবেশটা আমাকে একটা শব্দই মনে করিয়ে দিয়েছিল ...তা হল 'গণতন্ত্র'। ...১৯৩৬ সালের জুন মাসে সরকার (সংবিধানের) একটা খসড়া প্রস্তাব সাময়িকভাবে গ্রহণ করে এবং জনগণের মধ্যে তার ছ'কোটি প্রতিলিপি ছড়িয়ে দেয়। এই প্রস্তাব নিয়ে পাঁচ লক্ষ সাতাশ হাজার মিটিং-এ আলোচনা হয় ও তাতে তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করে। কমবেশি এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সংশোধনী আসে — যার অনেকই অবশ্য ছিল একে অন্যের অনুরূপ।'' সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানাতে ''সোভিয়েট ইউনিয়নের কোটি কোটি মানুষ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শীতের রাস্তায় নেমে আসে।''

সুদূর চীন থেকে মাদাম সান ইয়াৎসেন বলেন, ''মানবজাতির মহত্তম কীর্তি''। আর শান্ত জেনিভা হ্রদের উপকণ্ঠ থেকে রোমা রোলাঁ মন্তব্য করেন, 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর যে মহান স্লোগান এতদিন মানবজাতির স্বপ্নে ছিল তা আজ প্রাণ পেল।''

সবশেষে তাই আজকের বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের পচন দেখে লিংডোর মত যারা হতাশ হবেন, তাদের কাছে এই বার্তাটা আমরা পৌঁছে দিতে চাই; গণতন্ত্রের যে আদর্শ বুর্জোয়া বিপ্লব একদিন তুলে ধরেছিল, তাকে বাস্তবে পেতে গেলে সমাজতন্ত্র আমাদের গড়ে তুলতেই হবে।

মেদিনীপুরে যুব বিক্ষোভ

সমস্ত বেকারের কাজের দাবিতে, মদের ঢালাও লাইসেন্স ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতার প্রতিবাদে ৭ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক অফিসে বিক্ষোভ দেখাল এ আই ডি ওয়াই ও জেলা শাখা। কয়েকশ যুবক-যুবতীর এক সুসজ্জিত মিছিল মেদিনীপুর স্টেশন থেকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে জেলা শাসক অফিসের সামনে উপস্থিত হয়। বিক্ষোভ-অবস্থানে যুব সমাজের নানান সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মেদিনীপুর জেলা সভাপতি কমরেডস্ চিত্ত পড়্যা, সম্পাদক তমাল সামন্ত, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ঝণ্টু নায়েক। বিক্ষোভে মদের বোতলের প্রতীকী কুশপুতুল দাহ করা হয়।

দানবের গর্ভে বসে আমরাও প্রতিরোধে সামিল

হিদার কোটিন জারভেসি

নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য গড়ে ওঠা আমেরিকার লড়াকু সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার ও 'আনসার'-এর প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড হিদার কোটিন জারভেসি গত ১৫-১৬ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে এসেছিলেন। তাঁর লিখিত ভাষণটি এখানে প্রকাশ করা হল।

আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদই হল মানবজাতির সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ। এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার সুপার পাওয়ার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হল মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু।

যে দেশ থেকে আমি এসেছি, সেই সাম্রাজ্যবাদী দানবটি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিবাদী দালালদের সাথে একযোগে কাজ করছে এবং সারা পৃথিবীকে নিজের মুঠোয় নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কিন সরকার ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শিকারি ঈগলের মতো বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের ওপর হিংস্র থাবা কায়েম রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং পৃথিবীর জনগণকে রক্তাক্ত মুঠিতে জোর করে ধরে রাখার জন্য বেপরোয়া হিংস্র প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু জনগণ আজ প্রতিরোধে সামিল। ইরাক এবং প্যালেস্টাইনেই এই প্রতিরোধের চিত্র সবচেয়ে পরিষ্কার। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে — বলিভিয়া, কিউবা, চিয়াপাস, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং ব্রাজিলে সাধারণ মানুষ এই সাম্রাজ্যবাদী দানবের মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের গোলার্ধ থেকেই সবচেয়ে বড় হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে।

সেই দানবের গর্ভে বসে আমরাও প্রতিরোধে সামিল হয়েছি। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার', বিশ্বায়ন বিরোধী প্যালেস্টাইন ও লাতিন আমেরিকান সংগ্রামী শক্তি, মুমিয়া আবু জামালের গোষ্ঠীর কর্মী প্রভৃতি সকল শক্তি যাঁরা বুশ প্রশাসনের যুদ্ধ পরিকল্পনা ও আমেরিকার অভ্যন্তরে নাগরিক স্বাধীনতা দমন করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব — তেমন ১০টি গোষ্ঠীর সাথে একযোগে তৈরি করেছি International ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism)। ২০০১-এর সেপ্টেম্বরেই আফগান যুদ্ধের প্রতিবাদে ওয়াশিংটন ডি সি-তে আমরা মিছিল করেছি, এপ্রিল ২০০২-এ প্যালেস্টিনীয়দের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করেছি, ২০০৩-এর জানুয়ারি মাসে ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ৫ লক্ষ মানুষকে নিয়ে মিছিল করেছি। প্রতিবারই আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। প্রত্যেকবার, আরো বেশি সংখ্যক দেশ আমাদের মিছিলের দিনেই নিজের দেশে মিছিল করেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ ইয়র্কে ৫ লক্ষের বেশি মানুষের মিছিল হয়েছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিল করেছেন। আমাদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ মার্কিন সরকারের বিরামহীন যুদ্ধযাত্রাকে বন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের বিক্ষোভ অব্যাহত থেকেছে। গত মার্চ, এপ্রিল এবং ২৫ অক্টোবর ওয়াশিংটন ডি সি এবং সানফ্রানসিস্‌কো শহরে লক্ষ মানুষের মিছিলে আমরা সামিল হয়েছি। আমাদের দাবি ছিল — 'ইরাক দখল বন্ধ কর এবং সেনাদের ঘরে ফিরিয়ে আনো।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা, মার্কিন ঠাণ্ডা যুদ্ধের একজন রূপকার জিবিগনিউ ব্রেজেজিনস্কি, আফগানিস্তানের সংঘর্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নকে টেনে নামিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এর ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, যার ভার বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যা সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোবল ভেঙে দেয় ও শেষপর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভাঙন ডেকে আনে।

মার্কিন রিপাবলিকান পার্টির দলিল 'প্রোজেক্ট ফর দি নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি' ১৯৯২ সালে লাগাতার যুদ্ধের এক পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক — উভয় দলের সমরবিদরা 'ইউরেশিয়া' দখল করার এক মার্কিনী পরিকল্পনার সূচনা করেন। এই 'ইউরেশিয়া' শব্দটি শেষ শোনা গিয়েছিল নাৎসি জমানায়। ক্লিন্টনের নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়ার ধ্বংস এবং পূর্বদিকে ন্যাটোর দখলদারি সেই পরিকল্পনাকেই আরো এগিয়ে দেয়।

কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দিন শেষ — একথা ভেবে থাকলে সাম্রাজ্যবাদীরা ভুল করছে। পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার শ্রমিকরা আজ সংগঠিত হচ্ছে, আঘাত হানছে। এবং খোদ এই সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে এবং মরণোন্মুখ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই বিশ্বজুড়ে আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইরাকের ওপর বেআইনি এবং ঠাণ্ডামাথার মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের পথে নামাই — নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার ভাষায় — সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের শক্তির প্রমাণ, যে শক্তিই হচ্ছে 'বিশ্বের অপর বৃহত্তম মহাশক্তি।' জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, দারিদ্র্য, উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অধিকারের প্রতি খোলাখুলি সমর্থন জানানোই হচ্ছে আমাদের ঐক্য ও সংহতির মূল কথা।

খোদ সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি থেকে আমি এসেছি, আমি সেইসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছি, যাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের গর্ভের ভিতর থেকেই লড়াই চালাতে, ক্রিমিনাল মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধতা করতে দায়বদ্ধ। আমরা নিশ্চিত যে, সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্য পরাজিত হবে। শেষপর্যন্ত মানুষেরই জয় হবে — সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে।

ইরাকিদের প্রতিরোধের ব্যাপকতা দেখে আজ বুশ প্রশাসন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এই প্রতিরোধ ''তাদের সামনে এক দীর্ঘ ও কঠিন বাধা''। আজ তারা ভয় পেয়েছে। সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আজ ভীত। ২১ শতকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতা ও দেউলিয়াপনা ১১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী দুটি যুদ্ধের ব্যর্থতায় পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জর্জ বুশের সরকার যখন সহজ লক্ষ্যবস্তু হিসাবে আফগানিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল, সেই সময়ই তার নজর ছিল ইরাকের দিকে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড বলেছিলেন যে তিনি ইরাককে 'আঘাত' করতে চান। রামস্‌ফেল্ড আরো বলেছিলেন, ''ব্যাপক আঘাত হানো।'' ২০০২-এর জুলাই মাসে, বুশ প্রশাসনের এক সদস্য ইরাক হানা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় কণ্ডোলিজা রাইস বলেছিলেন — ''চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া গেছে, এখন বৃথা বাক্যব্যয় কোরনা।'' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপর তেলের জন্য ইরাক আক্রমণ করল।

যুদ্ধ করে মারা যেতে রাজী — এমন সৈন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট নেই। শুধু যে মার্কিন সেনাদের মনোবলই তলানিতে এসে ঠেকেছে তাই নয়, অন্য কোনও দেশ তাদের কতজন যুবককে ইরাক, আফগানিস্তান বা অন্য কোথাও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পাঠাতে পারবে — সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এদিকে ব্রিটিশ বিদেশ সচিব জ্যাক স্ট্র আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে, আরো সেনা না পাঠানো হলে ইরাকে জোটশক্তির পরাজয় ঘটতে পারে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখপাত্র স্ট্র্যাটফর পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, ''ইরাকে আত্মরক্ষামূলক আক্রমণ চালাতে গিয়ে বহু সংখ্যক মার্কিন সেনার মৃত্যু হবে।''

মার্কিন সেনারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছে, তারা আর যুদ্ধ করতে চাইছে না। অন্যদিকে ইরাকি প্রতিরোধ প্রতিদিন আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অসন্তুষ্ট মার্কিন সেনারা যত্রতত্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে। তারা এখন ঘরে ফিরতে চায়। যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা যত বাড়ছে, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে তত বেশি সংখ্যক মানুষ সামিল হচ্ছে।

সবচেয়ে বেপরোয়া আক্রমণে শ্রমজীবী শ্রেণীর যুবকরাই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। পুরো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাটাই এই যুবকদের মারবার এবং মরবার ইচ্ছার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চশিক্ষার বিপুল ব্যয়ের চাপে, বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে থাকা যুবকরা চাকুরিদাতাদের মিথ্যা কথায় ভুলে হাজারে হাজারে মার্কিন সেনাবিভাগে যোগ দেয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়। যদি খাদ্য, ভালো চাকরি এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই জোটার ব্যবস্থা থাকত, কিংবা যদি কলেজ শিক্ষা এবং চিকিৎসা পরিষেবা বিনা পয়সায় মিলত, তাহলে এইসব যুবকরা কখনই সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতো না।

ইরাকে মার্কিন সেনারা আজ অধিকাংশ জনগণের ঘৃণার পাত্র। সেনারা অন্যান্যদের থেকেও ভাল জানে মার্কিন সরকার কীভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ইরাকে নিয়ে এসেছে এবং তারা এও জানে যে এই বদ্ধ জলা থেকে মার্কিন সরকার সহজে তাদের মুক্তি দেবে না।

তেল উৎপাদক দেশ বা যে সব দেশ তেল উৎপাদক দেশের সীমানায় অবস্থিত — সে সব দেশের প্রায় সবগুলিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপস্থিতি বজায় রেখেছে। মার্কিন দেশের নাগরিক এবং তার সৈন্যরা সকলেই জানে যে ইরাক আক্রমণের মূল লক্ষ্য তেল সম্পদ দখল করা। সারা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে স্লোগান উঠেছে — ''তেলের বদলে রক্ত নয়!''

ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশ ইরাকে সেনা পাঠাতে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত প্রকল্পে টাকা ধার দিতে নিতান্তই দ্বিধাগ্রস্ত। এদিকে রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনও না পাওয়ায় ন্যাটোর মার্কিন প্রতিনিধি নিকোলাস বার্নস চেয়েছেন — এই বিষয়টিতে ন্যাটো হস্তক্ষেপ করুক। তাই তিনি বলেছেন — ''বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যেই নিহিত রয়েছে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ।'' রিপাবলিকানদের প্রস্তাবে ডেমোক্র্যাটরাও সায় দিয়েছে। ৩ নভেম্বর বিল ক্লিন্টন বলেছেন — ''ইরাকের ক্ষেত্রে যদি ন্যাটোকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে ওখানে যে সব কার্যকলাপ চলছে, সেগুলি আন্তর্জাতিক সমর্থন পাবে।''

মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে এই দুই পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলের কখনই মতবিরোধ হতে দেখা যায় না। হেনরি কিসিংগার বলেছিলেন — ''তেল এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য যে এটাকে আরবদের হাতে ফেলে রাখা ঠিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না

হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন কর্তা

তথাকথিত বিতর্কিত প্রাক্তন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি পল ওনীল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, বুশ প্রশাসনের সঙ্গে প্রায় বছর দুয়েক যুক্ত থাকাকালে কোন সময়ই তিনি এমন কোন প্রমাণ দেখেননি, যা থেকে বলা যায় যে ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ট্যাক্স কমানোর পরিকল্পনাকে ঘিরে মতদ্বৈধতায় বুশ ওনীলকে তাঁর প্রশাসন থেকে ছাঁটাই করে দেন।

ক্ষমতায় বসার পর প্রথম দু'বছরে বুশ প্রশাসন কী ঢঙে কাজ করত, সে সম্পর্কে প্রধানত ওনীলের দেওয়া তথ্যকে ভিত্তি করে রন সাসকিন্ডের লেখা বই দি প্রাইজ অব লয়ালটি (আনুগত্যের মূল্য) প্রসঙ্গে টাইম ম্যাগাজিন এবং সি বি এসের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওনীল কথাগুলি বলেন। তিনি জানান যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার বহু আগে, বস্তুত বুশ প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পর পরই ইরাকে মার্কিন সৈন্য পাঠিয়ে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়ে গিয়েছিল। প্রথম থেকেই বুশ প্রশাসন বোঝাতে চেয়েছে যে সাদ্দাম হোসেন একজন বাজে লোক ও তাকে বিদায় করা দরকার। ফলে অচিরেই প্রশাসনের লোকজন নানারকম অভিযোগ করতে থাকে। দীর্ঘদিন প্রশাসনের মধ্যে থাকার ফলে ওনীলের বক্তব্য — তাঁর কাছে প্রমাণ এক জিনিষ আর 'জোরালো দাবি', 'মনে হওয়া' এবং কিছু ধরে নিয়ে তার ওপর সিদ্ধান্ত করানো আর এক জিনিস। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনি বলেছেন — 'আমার মতে প্রকৃত প্রমাণ ও অন্য সমস্ত কিছু — এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এবং আমি কখনই গোয়েন্দা বিভাগের কাছে এমন কিছু দেখিনি যাকে আমি প্রকৃত প্রমাণ বলতে পারি।'

ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে তথ্য ওনীলের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না — এই কথা বলে মার্কিন প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ অফিসার বিষয়টিকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন প্রশাসন যে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার চালিয়ে এসেছে, সে সম্পর্কে নানাদিক থেকে বহু তথ্য ইতিমধ্যেই বিশ্বের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ওনীলের বক্তব্য সেই তালিকায় আর এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। (সূত্র ঃ দি ডেকান হেরাল্ড, জানুয়ারি ১৩,২০০৪)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু

পাঁচের পাতার পর

নয়।'' ১৯৮০ সালে কার্টারের দপ্তরের একজন বলেছিলেন — ''তেলের প্রবাহের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার অধিকার কার্টারের আছে। ... কোনো আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ শুরু হলেও মার্কিন ফৌজ ব্যবহার করা যেতে পারে।''

সুতরাং ইরাকে যে সেনাবাহিনী ব্যাপক গেরিলা হানার সম্মুখীন হচ্ছে, সেই বাহিনীতে সারা দুনিয়ার মেহনতি শ্রেণীর মানুষকে নিয়োগ করতে পারার ওপরেই নির্ভর করছে ইরাক ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার সাফল্য। বিশ্বজুড়ে সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থার অবনতির ফলেই ইরাক এবং অন্য দেশে সৈন্য মোতায়েন করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীরা আশান্বিত হয়ে উঠেছে।...

ইরাকে নিজেদের দুরবস্থা সামাল দিতে আরো বড় আকারের যুদ্ধের আলোচনা চলছে। স্ট্র্যাটফর লিখছেন — 'আগামী কয়েক মাসে আমরা আরো আগ্রাসী মার্কিন আক্রমণ ঘটবার প্রত্যাশায় রয়েছি।' স্ট্র্যাটফর আরো লিখছেন — আঞ্চলিক শক্তি জোটকে ব্যবহার করে ওয়াশিংটন এমন অবস্থা সৃষ্টি করছে যাতে সিরিয়া কোনও সমর্থন না পায়। ইজরায়েলের সহযোগী হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজ করবে এবং এই সহযোগিতার সুবিধাও সে ভোগ করবে।

ইরাকের দুর্ধর্ষ গেরিলা যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারি চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে এবং তাই সেই দায়িত্ব আমেরিকা অর্পণ করছে আরব অঞ্চলে তার অপরাধের জুনিয়ার সহযোগীর ঘাড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থপুষ্ট ইজরায়েল আগেও দামাস্কাসের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। গত মাসে সিরিয়ায় ইজরায়েলের বোমা ফেলার অর্থই ছিল, অবরোধ বা যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ধ্বংস না হওয়া একটি দেশে মার্কিন হামলার হুমকি দেওয়া। ইরাকের তুলনায় সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী। আবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এই দেশটি বরাবরই ক্রুদ্ধ। তাছাড়া সিরিয়া তেলসম্পদ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধও বটে। ইরাকে সঙ্কট বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও সিরিয়াকে হুমকি দিয়ে চলেছে। কিন্তু কেন? স্ট্র্যাটফরের বিশ্লেষণ হল — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি দেশ অধিকার করে সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে এবং তারপর সেখান থেকে এলাকার অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে। তাছাড়া যে ইসলামিক বিশ্বের চোখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এক ঘৃণার পাত্র কিন্তু নিবীর্য শক্তি, সিরিয়া আক্রমণের দ্বারা সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে, — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচিত হবে ঘৃণ্য কিন্তু আতঙ্কজনক শক্তি হিসাবে।

ইরাককেও ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হবে, মার্কিন সেনাবাহিনী এবং সেখানকার মানুষজনকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে। লিবারেল এবং কনজারভেটিভ — উভয়পক্ষই মার্কিন সরকারকে চাপ দিয়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ক, যিনি জর্জ সোরোসের 'ইণ্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ' এবং মার্কিন সেনাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত, একটি নতুন বইয়ে মন্তব্য করেছেন — একটি দেশের সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধে লড়তে অনিচ্ছুক হয় তাহলে 'সুপার পাওয়ার' হয়ে থাকা খুব কঠিন। ক্লার্ক আরো বলেছেন — মার্কিন সেনারা বড় যোদ্ধা সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষা করতে পারে না। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে আমাদের শক্তির অন্য উৎসের সন্ধান করতে হবে।

কী সেই স্বার্থ? ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ডের পাতা থেকে — ''মানবিক পুনর্নির্মাণের ছদ্মবেশে সম্পদে সমৃদ্ধ ইরাকের প্রতিটি ক্ষেত্রকে তুলে দেওয়া হচ্ছে একচেটিয়া ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী — বিশেষ করে যারা আমেরিকা থেকে এসেছে, তাদের হাতে। বস্তুতপক্ষে এর জন্যই যুদ্ধ বাধানো হয়েছিল। ... যেদিন রাষ্ট্রসংঘে স্থির হল মার্কিন 'অকুপেশন অথরিটি' র হাতে ইরাকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হবে, ঠিক সেদিনই জর্জ ডব্লিউ বুশ একটি সরকারি আদেশ (Executive Order 13303) জারি করে, যে সমস্ত মার্কিন তেল কোম্পানি ও এনার্জি কর্পোরেশন ইরাকে টাকা বিনিয়োগ করেছিল, তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আদেশে বলা হয়েছে, এই সমস্ত তেল কোম্পানিগুলিকে সমস্ত রকম মামলা-মোকদ্দমার আওতা থেকে দূরে রাখা হল, কারণ মামলা-মোকদ্দমায় এরা জড়িয়ে পড়লে ''ইরাকের পুনর্নির্মাণের কাজ ব্যাহত হবে।''

বার্ণস-এর মতো ক্লার্কও চান নিজেদের এই স্বার্থরক্ষার্থে 'ন্যাটো' এবং বিশ্বব্যাঙ্ক এগিয়ে আসুক। কারণ তাঁদের ''নিজেদের মধ্যেকার এই পরস্পর নির্ভরশীলতাই সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের গোপন রহস্য।'' নিজেদের এই জোটকে তিনি নাম দিয়েছেন — 'ভার্চুয়াল এম্পায়ার', কার্যত এক সাম্রাজ্য। যুগোস্লাভিয়ায় মার্কিন বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান স্বীকার করেছেন যে একা মার্কিন 'সুপার পাওয়ার'-এর পক্ষে শুধু সামরিক শক্তির জোরে উপনিবেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা সম্ভব নয়।

রামস্‌ফেল্ড এবং চেনী যে 'অনন্ত যুদ্ধ'র পরিকল্পনা করেছেন, ক্লার্ক তার বিরোধী নন; কিন্তু তিনি শুধু চান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অন্যেরাও লড়ুক। সেপ্টেম্বরে মার্কিন প্রশাসনের এক কর্তা যখন ঘোষণা করলেন যে মার্কিন সুরক্ষার প্রশ্নে সিরিয়া খুবই বিপজ্জনক, সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউস দামাস্কাসকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দিল। অক্টোবর মাসে হোয়াইট হাউস ইরান ও মালয়েশিয়াকেও হুমকি দিয়েছে। ইজরায়েলের হাতে ডুবোজাহাজ, আকাশ ও স্থল ব্যবহারের উপযোগী পারমাণবিক অস্ত্র আছে — এই বলে দু'জন মার্কিন কর্তা সিরিয়াকে ভয় দেখিয়েছে। সিরিয়া সেই হুমকির মর্ম বুঝতে ভুল করেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় মধ্যপ্রাচ্যে নিজের ঘাঁটি গেড়ে বসে ক্রমাগত পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করতে। ১৯ শতকের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ও সমরবিদ হ্যালফোর্ড ম্যাককাইন্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রেজেজিনস্কি 'দি গ্র্যাণ্ড চেসবোর্ড' নামক বইতে ১৯৯৭ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি সমগ্র 'ইউরেশিয়া'র ওপর মার্কিনী বিজয়কে তুলে ধরেছেন। ব্রেজেজিনস্কি শুধু যে ন্যাটো'র প্রসারণ চেয়েছেন তাই নয়, মধ্য এশিয়া — যাকে তিনি 'ইউরেশিয়ান বল্‌কান' বলে অভিহিত করেছেন, সেখান থেকে শুরু করে গোটা এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারই তাঁর কাম্য। তিনি বলেছেন, ইউরেশিয়ান বল্‌কান অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি উপহার বিশেষ। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা খনিজ ও সোনার অসাধারণ সমাবেশ ঘটেছে।

বুশ প্রশাসন ব্রেজেজিনস্কিদের এইসব পরিকল্পনা রূপায়িত করছে মাত্র। ১৯৯৭ সালে সতর্ক করে দিয়ে ব্রেজেজিনস্কি বলেছিলেন — আগামী ২০ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে। ম্যাককাইন্ডার কথিত সেই 'হার্টল্যাণ্ড' ইউরেশিয়া দখলের জন্য ১৯৯০-এর দশকে ক্লিন্টন কাজ শুরু করেন। ২১ শতকের প্রথমার্ধে বুশ সেই কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ব্রিটেন চেষ্টা করেছে, জার্মানিও চেষ্টা করেছে; অবশেষে এসেছে ওয়াশিংটন। তার ধারণা সেই কাজটা সম্পূর্ণ করবে — কিন্তু কখনই সে তা পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে অনেক চিন্তাবিদ (think tank) এবং সমরবিদ থাকতে পারে, অনেক ধরনের পরিকল্পনাও তাদের আছে; অসাধারণ শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকার পাহাড় হয়তো তাদের আছে। কিন্তু এতসব কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা কখনই শ্রমিকশ্রেণীকে পরাজিত করতে পারবে না। সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা এখন অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে; এ খেলায় তারা হারতে বসেছে। ইরাকে প্রতিরোধ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে; খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করছে। ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড-এ ব্রায়ান বেকার লিখছেন — ''চেকপয়েন্টগুলিতে সেনাদের দিয়ে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা এবং রাত দুপুরে তাদের ঘুমন্ত দরজা লাথি মেরে খুলে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ও আগ্রাসন সাধারণ মানুষের ঘৃণা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গেরিলা আক্রমণের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি, প্রতিরোধকারী সংগঠনের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মার্কিন সেনাদের হতাহত হওয়ার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা।'' *(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)*

শ্রমিক আন্দোলন করতে পারবেনা

একের পাতার পর

শ্রমিককে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই অবস্থায় আমরা দাবি করেছিলাম, রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করে চা বাগানের মালিককে বাগান খুলতে বাধ্য করুক, যারা বাগান খুলবে না তাদের লিজ বাতিল করে সরকার অধিগ্রহণ করুক। তখন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব সব্যসাচী সেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৪ জানুয়ারি বুধবার সব্যসাচীবাবু বিভাগীয় মন্ত্রী নিরুপম সেনের হাতে তাঁর রিপোর্টটি তুলে দেন। রিপোর্টে তিনি চা-বাগানে শ্রমিকদের ভয়াবহ অবস্থার কথা এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি সঙ্কট নিরসনে বন্ধ চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন। এই কমিটির বক্তব্য হল, যেসব মালিক চা-বাগান চালাচ্ছেন না তাঁদের কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়ে বাগান চালাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিক রাজ্য সরকার। আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে এই কমিটি জানিয়েছে, দীর্ঘ মেয়াদী লিজে দেওয়া জমি রাজ্য সরকার চাইলেই ফেরত নিতে পারে। এই কমিটির আরও বক্তব্য হল, বাগান ফেলে রাখা মানে লিজের শর্ত লঙ্ঘন করা। আইনের এই ধারাকে কাজে লাগিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে সরকারি কমিটি। ইতিপূর্বে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকও অনুরূপ সুপারিশ পাঠিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে।

কিন্তু রাজ্য সরকার মালিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে এতই উদ্‌গ্রীব যে সরকারি কমিটির সুপারিশ, জেলাশাসকের সুপারিশ, গণআন্দোলনের দাবি কোন কিছুকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বরং শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, ''কোন শিল্পেই আন্দোলনের নামে যা খুশি তাই করা যাবে না। ঘেরাও, মারপিট, ভাঙচুর এসব আমরা বরদাস্ত করবো না।'' (গণশক্তি ১৭-১-০৪)।

মুখ্যমন্ত্রী চা বাগানে কোথায় ঘেরাও, মারপিট দেখলেন? শ্রমিক আন্দোলনের জন্য একটি বাগানও বন্ধ হয়নি। বাগানের মালিকরা বছরের নির্দিষ্ট কয়েক মাস (যখন পাতা তোলার কাজ থাকে না) বাগানে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই হুমকি দিয়ে বললেন, কোন আন্দোলন চলবে না। মালিকরা বাগান বন্ধ করে শ্রমিকদের অনাহারে মারবে, তাদের ন্যায্য রেশন থেকে বঞ্চিত করবে, বোনাস দেবে না — এসব অত্যাচার মালিক চালাতে পারবে। এসব চলবে সি পি এম ফ্রন্ট শাসনে। কেবল চলবেনা শ্রমিকদের আন্দোলন — এর নাম কি বামপন্থা?

অবিলম্বে বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে ৬ জানুয়ারি চা-শ্রমিকদের মিছিল জলপাইগুড়িতে

নারী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজন জ্ঞানের চর্চা ও দরদী মন

মহিলা সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

(মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে (২৯ ডিসেম্বর, ২০০৩) এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হল)

নারীজীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের দাবিতে একটা শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আপনারা এসেছেন। নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, সমকাজে সমবেতন চালু করা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা — এসকল দাবি যেকোন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষই সমর্থন করবেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দাবিগুলো উত্থাপন করার সময় আপনাদের স্মরণে রাখতে হবে, আজও এদেশে কোটি কোটি নারী, মা-বোনেরা আছে, যাদের কাছে নারীমুক্তি, নারীমর্যাদা, নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার — এ কথাগুলো আদৌ পৌঁছায়নি। যারা ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে যারা এখনও নিমজ্জিত, যে মা-বোনদের ঘরে ঘরে কর্মচ্যুত বেকার স্বামী, অসুস্থ, ওষুধ নেই, অনাহারক্লিষ্ট সন্তানরা কাঁদছে, কী খাবে, কী পরবে তারই স্থিরতা নেই, তাদের একটিই দাবি — খাওয়ার সংস্থান দাও, প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও। এদের নিরুপায় দুঃখময় জীবনে নারীর অধিকার, মর্যাদা এসব ভাববার অবকাশ কোথায় ? এদের অধিকাংশই মনে করে, এ তাদের পূর্বজন্মের ফল ! সত্যিই কি তাই ? এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে ? এই প্রশ্নের জবাবের সাথেই এদেশের নারীমুক্তি আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এজন্যই এযুগে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক, বিশিষ্ট মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই বলেছেন, নারীর প্রকৃত মুক্তি ও অধিকার অর্জন কোনমতেই সম্ভব নয় যতক্ষণ প্রচলিত পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। নারীমুক্তির প্রশ্ন এই পুঁজিবাদী শোষণ নির্যাতন উচ্ছেদের সাথেই যুক্ত।

আপনারা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মা-বোনের প্রতিনিধি হিসাবে এই সম্মেলনে এসেছেন একটা সংগ্রামী কর্মসূচি নেওয়ার জন্য। আপনারা সেই সংগ্রামে কী ভূমিকা নেবেন, তার উপর নির্ভর করছে এই সম্মেলনের সাফল্য।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গণসংগঠনগুলির মধ্যে নারী সংগঠনের কাজটিই সবচেয়ে কঠিন। নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে কম। এর সাথে নারীদের জীবনে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব, নানা কুসংস্কারের প্রভাব ছাড়াও নানা বিধিনিষেধের জাল এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, সেখান থেকে বের করে আন্দোলনে তাদের সামিল করানো অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এবং সেদিক থেকে বহু বাধার সামনে আপনাদের পড়তে হচ্ছে, আগামী দিনেও পড়তে হবে। এই ঝড়ঝঞ্ঝা, পরাজয়, ব্যর্থতার মধ্যেও সংগ্রামের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের কমরেড শিবদাস ঘোষের কয়েকটি কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাব। লড়বেন বলে যে প্রতিজ্ঞা আপনারা নিচ্ছেন, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তা অটল থাকবে কি না, তা কেবল সৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন এবং তা রূপায়িত করার জন্য সঠিক বিপ্লবী চরিত্রের ওপর। বিপ্লবী রাজনীতি, বিপ্লবী চরিত্রের উৎস হচ্ছে হৃদয়বৃত্তি, ভালবাসা। শোষিত নির্যাতিত মানুষের প্রতি ভালবাসার জন্যই, তাদের ব্যথা-যন্ত্রণা-কান্নায় অস্থির হয়েছি বলেই আমি লড়াই না করে পারি না। আঘাত-ব্যর্থতা যাই আসুক, তবু আমাকে লড়তে হবে, নাহলে আমি নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। হৃদয়ের সাথে হৃদয় যুক্ত না হলে এই হৃদয়বৃত্তি কখনো আসে না। দুনিয়ায় যুগে যুগে যত বড় মানুষ মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করেছেন, তাঁরা ডাক দিতেই হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে এসেছে, সমর্থন দিয়েছে, এমন ঘটেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ একাকী যাত্রা শুরু করেছিলেন। কত বাধা ও বিরুদ্ধতার সামনে তাঁকে লড়তে হয়েছে, চলতে হয়েছে। এঁদের এই লড়াইয়ের শক্তির উৎস কোথায় ? সে ঐ হৃদয়বৃত্তির মধ্যে। তিনিই একদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন — শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাতেই কি আমি তুষ্ট ? এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী ? বাঁচতে হলে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে হবে। সমাজের কোটি কোটি শোষিত নারীপুরুষের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের মধ্যেই রয়েছে সেই মর্যাদা। সমাজ সভ্যতার বিকাশের প্রশ্নে যা প্রয়োজন, মানুষের মুক্তির যা দাবি, তার ভিত্তিতে আমার বিবেক যা বলছে, আমি তাই করছি। সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ — বিপ্লবের আদর্শকে আমি জীবনে গ্রহণ করেছি, এটাই আমার মর্যাদা। আমি ভীরু-কাপুরুষ নই, আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপর নই — এই উপলব্ধির মধ্যে যে আনন্দ, বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিকদের শক্তির উৎস এখানেই। এজন্যই ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-প্রীতিলতারা হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে গেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, বিপ্লবী আন্দোলনে যারা এগিয়ে আসে, তাদের দিতে হয় বেশি, ছাড়তে হয় বেশি। কিন্তু বাস্তব জীবনে এখানেই মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় বেশি। যখন কর্তব্যের আহ্বান শুনি, তখন মন দায়িত্ব নিতে চায়। কিন্তু করবার মুহূর্তে আরেক মন পিছন থেকে টানে, দ্বিধায় ফেলে দেয়। এই টানাপোড়েনে মন ক্ষতবিক্ষত হয়, তারপর একদিন বলতে হয় 'নিজের কাছে আমি হেরে গেলাম', 'আমি পারলাম না।' কেন পারলাম না ? মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বলব — প্রচলিত সমাজের ন্যায়নীতিবোধ, ভাল-মন্দ-দায়িত্ব-কর্তব্যের ধারণা, যা আমরা সমাজ থেকেই পাই, সেগুলোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজে মেয়েদের মধ্যে একটু একটু করে যখন বোধশক্তি আসতে থাকে, তখনই মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের পক্ষ থেকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়ে যায়। কিসের ট্রেনিং ? পরের ঘরে ওর বিয়ে হবে, স্বামীর ঘর করবে, সেজন্য কীভাবে খেতে-বসতে-শুতে-হাঁটতে হবে তার ট্রেনিং। এজন্য কোন বই পড়া লাগে না। অথচ বিয়ে তো ছেলেরাও করে, তাদের কিন্তু ছোটবেলা থেকে এমন ট্রেনিং হয় না। দুই মেয়ে বন্ধুর মধ্যে দেখা হলেই কথা হয় — তোর বিয়ে হয়েছে ? বিয়ে না হলে তৎক্ষণাৎ দুশ্চিন্তা। আর বিয়ে হলেই প্রশ্ন — সন্তান হল কি না। মেয়েদের মধ্যেও বিয়ের আগেই মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এসে যায়। বিয়ের পর পুরুষ মনে করে স্ত্রী'র দেহ-মন সবকিছুরই সে মালিক হয়ে গেল, স্ত্রীও সেটাই মনে করে — তা সে স্ত্রী যত উচ্চ ডিগ্রিধারীই হোক না কেন। তারা মনে করে, স্বামীই দেবতা, নারীপুরুষ সমান হতে পারে না — এ বিধির বিধান। এই যে স্বামীসর্বস্ব, বিবাহসর্বস্ব মন, এখানেই পুরুষের কর্তৃত্ব-আধিপত্যের জোর, এখানেই নারীর মুক্তির প্রশ্নটি প্রধানত আটকে আছে। পুরুষকেও যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হলে এই কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। এসব ধারণা হাজার হাজার বছর ধরে বহু গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়ে মেয়েদের রক্তমাংসের মধ্যে মিশে আছে। একটা সভায় আলোচনা করে দিলাম, অমনি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল — এত সহজ নয়। মনকে দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কার থেকে মুক্ত করা খুবই কঠিন, তুলনায় কামান বন্দুক নিয়ে লড়াই অনেক সহজ। এজন্য আপনাদের প্রয়োজন জ্ঞানচর্চা করা। ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জানতে ও বুঝতে হবে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে চিরদিন সমাজে এমন ছিল না, একদিন যে মাতৃশাসিত সমাজ ছিল, সেই ইতিহাস আপনাদের জানতে হবে। ভাসাভাসাভাবে নয়, জীবন্তরূপে উপলব্ধি করতে হবে। তাহলেই সেটা অন্যদের কাছে আপনারা জীবন্তভাবে উপস্থিত করতে পারবেন।

মাতৃশাসিত সমাজ আকস্মিকভাবে আসেনি, আবার তার ভাঙনও একটা দুর্ঘটনা নয়। আপনাদের জানতে হবে, কীভাবে জমিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী সম্পত্তি এল এবং স্থায়ী সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি মালিকানা এল — যেটা আদিম সমাজে, মাতৃশাসিত সমাজে ছিল না। দেখাতে হবে, কী প্রক্রিয়ায় সমাজে স্থায়ী সম্পত্তি আসার পর আধিপত্য করার মন, শোষণ করার মন এল, তাকে ভিত্তি করে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হল। তখনই নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য এল। দেখাতে হবে — কীভাবে বিধির বিধান চাপিয়ে দিয়ে নারীকে শৃঙ্খলিত করার ক্ষেত্রে সমাজ ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। সমাজে একদিন যেমন শোষক-শোষিত ছিল না, ধনী-দরিদ্র ছিল না, তেমনই নর-নারীর সম্পর্ক আজকের মত ছিল না। ফলে চিরদিন এমনই ছিল এবং চিরদিন সেটাই থাকবে — একথাটা ঠিক নয়। ইতিহাস তা বলে না। অতএব, মেয়েদের নিজেদের বুঝতে হবে যে, তাদের মধ্যে স্বামীসর্বস্ব, বিবাহসর্বস্ব মনটা আসলে একটা গোলামির মানসিকতা। তর্ক করে, প্রস্তাব পাশ করে এর থেকে মনের মুক্তি আসবে না, সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে না।

সতীদাহের বিরুদ্ধে, বিবাহ বিবাহের পক্ষে আইন হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সমাজের মন, নারীর মন থেকে পুরনো বিশ্বাস দূর হয়েছে কি ? এই প্রশ্ন শরৎচন্দ্র তুলেছিলেন। শাসনের হুকুমে বাইরের আগুন নিভেছে, কিন্তু ভিতরের দাহ তো এখনও চলছে। এই প্রশ্ন তুলেই তিনি সমাজমননে নাড়া দিতে, তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে এই ধারণা পৌঁছে দিতে চাইলেন, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে অনেক বড়। নারীকে সেই মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হবে, তবেই সে সত্যিকারের বড় হবে, সমাজগঠনে বিরাট অবদান রাখতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কোত্থেকে মেয়েরা পাবে ? সেজন্য জ্ঞানের চর্চা করতে হবে।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

সাধারণভাবে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কোনও বিষয়ে গভীরে গিয়ে জানার-বোঝার, বিচার-বিশ্লেষণ করার মনটা খুবই কম। আবার মেয়েদের মধ্যে এটা আরও কম। তাদের মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব বেশি। আর একটা মিথ্যা ধারণাও সমাজে যুগ যুগ ধরে চলছে, তাহল, পৃথিবীতে একদল চিরকাল ধনী এবং আর একদল গরিব, তেমনই নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেও সাধারণত পুরুষ সবসময়ই বুদ্ধির অধিকারী এবং নারীর বুদ্ধি তেমন নয়। যে জন্য কথা প্রচলিত হয়েছে — 'আমি স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলি না। মেয়েরা আবার কী বুঝবে ! মেয়েমানুষের আবার বুদ্ধি !' এই ধারণা তো মেয়েদের মধ্যেও আছে। অথচ, বিজ্ঞান বলে এবং ইতিহাসেও প্রমাণিত যে, নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি পুরুষের থেকে কোন অংশেই কম নয় এবং নারী বা পুরুষ কেউই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না, জন্মের পর অর্জন করে।

ধর্ম ও শাস্ত্রের বিধিনিষেধের প্রভাবও মেয়েদের উপর বেশি। সামন্ততন্ত্রে যুগ যুগ ধরে এ জিনিস চলেছে, ধর্মের নামে তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজেও তা অব্যাহত আছে। একটা কথা খুব গর্বের সাথে প্রচার করা হয় যে, ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ, এদেশের মূল

আটের পাতায় দেখুন

SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

গণদাবী ২৩ জানুয়ারি, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ২৩ সংখ্যা

চাই জ্ঞানের চর্চা ও দরদী মন

সাতের পাতার পর

সুরটাই নাকি ঈশ্বরতত্ত্ব, ভগবৎ প্রেম। অন্যান্য দেশে যেখানে বস্তুবাদী চিন্তা এসেছে, তাদের সাথে ভারতের মিলবে না। ফলে এদেশের সাংস্কৃতিক মুক্তি ঐ ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যেই, ধর্মের মধ্যেই খুঁজতে হবে। এটা অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক ও মিথ্যা প্রচার। ভারতবর্ষেও ঈশ্বরচিন্তা আসার আগে, অন্যান্য দেশের মতই বস্তুবাদী চিন্তা ছিল। চার খন্ডের যে বেদকে হিন্দুরা মানে, তার প্রথম বেদ — ঋক্‌বেদ — সেখানে ধর্ম, ঈশ্বরচিন্তার বিশেষ অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতি আছে। চন্দ্র-সূর্য-আগুন-মাটির কথা আছে, তাদের নিয়ে মন্ত্র আছে। প্রকৃতি বা বস্তুজগতের বাইরে কোনও ঈশ্বরচিন্তা সেখানে নেই। এদেশের উপনিষদগুলির মধ্যে বৃহৎ আরণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা বিশেষভাবে বলা যায়, যেখানে ঈশ্বরতত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে যুক্তি করা হয়েছে। এদেশের কণাদ নামের মুনি বলেছিলেন, এ বিশ্ব অনুর দ্বারা গঠিত। এ চিন্তা বিশ্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী চিন্তা। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রামায়ণ মহাভারতেও এমন চরিত্র পাওয়া যায় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতো না। চার্বাক দর্শন বলেছে, প্রাণ কোত্থেকে এল, নানা বস্তুর মিলন থেকে এল। এসব জিনিস নারী আন্দোলনের কর্মীদের জানতেই হবে। কারণ, ধর্মীয় বিধানকে কেন্দ্র করে নানা সংস্কার-বিশ্বাস এদেশের নারীমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে। তারা মনে করে, শাস্ত্রের এই বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, করলে পরজন্মে শাস্তি হবে। এই সংস্কারকে না ভাঙতে পারলে মেয়েরা লড়বে কীভাবে ? এক যুগে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে যুগের ধর্মপ্রচারকরা মহান মানুষ ছিলেন। ধর্ম শ্রেণী-শোষণের পক্ষে কাজ করলেও, শ্রেণী-শোষণ মেনে নিলেও কতকগুলো কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিল। দাসপ্রভুরা দাসদের উপর যেভাবে যথেচ্ছ অত্যাচার করতো, নারীদের উপরও করতো, তা নিয়ন্ত্রণ করতে ধর্ম সেদিন কতকগুলো মূল্যবোধ নিয়ে এসেছিল, যেটা দাসপ্রথার প্রথম যুগে ছিল না। কিন্তু যেসব ধর্মপ্রচারক সেদিন শাসকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐ মূল্যবোধের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছেন, শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধতা করেছেন, তাঁদের লড়তে হয়েছে, এমনকি প্রাণও দিতে হয়েছে। এই অর্থে ঐসব ধর্মীয় প্রচারকদের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। এসত্ত্বেও ধর্মের মূল কথা যেহেতু এ জগতের সবকিছুরই স্রষ্টা ও চালক হচ্ছেন ঈশ্বর, তাই ঐ বিধানের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। অতএব শোষণেরও স্রষ্টা তিনি, ধনী ও গরিবের স্রষ্টাও তিনি, পুরুষের সেবার জন্য নারীরও জন্ম দিয়েছেন তিনি। এটা চিরদিন থাকবে, এর বাইরে কিছু হবে না। ধর্মীয় চিন্তা ও তাকে ভিত্তি করে বহু সংস্কার জগদ্দল পাথরের মতো নারীদের মুক্তির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যার বিরুদ্ধে না লড়ে নারীমুক্তি আন্দোলন এগোতেই পারবে না। শুধু তাই নয়, আজকের যুগে মানুষের যে সমস্যা, তার সমাধানের হদিশ কোনও ধর্মপুস্তকে পাওয়া যাবে না। সেজন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে সকল দিক দিয়ে ভাল করে পড়া, জানা ও গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। নাহলে নারী নিজেই নারীমুক্তি আন্দোলনের বাধা হিসাবে আজ যেমন আছে, তেমনই থেকে যাবে।

জ্ঞানের সঙ্গে চাই দরদী মন, হৃদয়বৃত্তি, প্রখর ন্যায়-অন্যায় বোধ। এখানেই নিহিত প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং চরিত্র। যা সত্য বলে শুনছি, জানছি, বুঝছি, সেভাবে নিজের জীবনকে পাল্টাবো। ফাঁকি দিয়ে চরিত্র অর্জন করা যায় না। সাজগোজ যাই হোক না কেন, আমার আসল চেহারা যা, তা থাকবেই। স্মার্টনেস, ওভার স্মার্টনেস, ম্যানেজ করা — এসব কিছুদিন চলতে পারে, কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় এসব কিছুই দাঁড়াবে না। আসল জায়গায়, হৃদয়ে-চরিত্রে আমার পরিবর্তন হচ্ছে কি ? দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, চাওয়া-পাওয়া — এসবের ক্ষেত্রে আমার মনোভাব কি ? আমি কি এই পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার শিকার ?

বিপ্লবী বিপিন পাল আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁরই বয়সী গ্রামের কিছু ছেলে শহরে তাঁদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। মা বড় থালায় সকলকে বসিয়ে খাওয়াতেন। বিপিন পাল লক্ষ্য করতেন, মা অন্যদের ভাল জিনিসটা বেশি দিয়ে তাঁকে কম দেন। একদিন অভিমান করে মা-কে সেকথা বলেনও। মা বললেন, আমি তোর মা, এখানেই আছি, ওদের মায়েরা তো এখানে নেই, এখানে আমিই ওদের মা। বিপিন পাল বৃদ্ধ বয়সে লিখেছেন — এমন মা পেয়েছিলাম বলেই কিছু শিখেছিলাম। ঐ মা-এর কিন্তু কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। আজ মেয়েদের মধ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষা কিছুটা এসেছে, কিন্তু এই শিক্ষা তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনন আনেনি, নৈর্ব্যক্তিক মাতৃত্বের ধারণা আনেনি। যে শরৎচন্দ্র নারী স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন, তিনি তাঁর সাহিত্যে নারী চরিত্র সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন — আজকের যুগে বাইরের প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি না আসার ফলে মেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতার নামে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, রুচিহীনতা এসেছে। আজকের সমাজে আমরা এটা ব্যাপকভাবে দেখছি। আমাদের আন্দোলনে নারীকে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করতে হবে। আমরা লড়ছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য। লেনিন বলেছিলেন, ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে যখন সামাজিক মালিকানা আসবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আসবে — তখনই একমাত্র শোয়ার ঘর-রান্নাঘর-আঁতুড় ঘর ও শিশুপালন —এই বন্দীচক্র থেকে নারীকে মুক্ত করা যাবে। সে পথে সোভিয়েট ইউনিয়ন এগিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের জন্য যারা লড়বে, তাদেরকেও ব্যক্তিস্বার্থবোধ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাদের ভাবতে হবে — অপরের আনন্দই আমার আনন্দ, পরের শান্তিই আমার শান্তি, গোটা সমাজের স্বার্থই আমার স্বার্থ। এজন্য নিজের সাথে নিজের লড়াই দরকার, এটা কঠিন লড়াই। কিন্তু এই লড়াই না করে এগোন যাবে না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রথম যখন এম এস এস গড়ে ওঠে তখন মাত্র ৫-৭ জন ছিল। আজ এই সংগঠনের মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, গোটা ভারতবর্ষে হাজার হাজার নারী সমবেত হচ্ছে। এই শক্তির উৎস মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা — যা ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙাচ্ছে, মানুষের বিবেক জাগাচ্ছে, লড়াইয়ের পথে তাদের সামিল করছে। শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব মহিলা সকল অংশের মানুষই আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এই শক্তি অপ্রতিরোধ্য। আমরা যে শক্তির জোরে চলছি, তা সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক, আদর্শ ও মূল্যবোধভিত্তিক। এই কথাটা আমাদের দলের ও গণসংগঠনের যাঁরা নেতা হবেন, তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে। এস ইউ সি আই যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ও তাঁর গুটিকয়েক সহযোদ্ধা, তাঁদের খাওয়া-থাকা-পরার সংস্থান ছিল না। ফুটপাতে, পার্কে রাত কাটিয়েছেন। কেউ তাঁদের চিনত না, জানত না। আজ তো আমাদের জন্য কত আয়োজন, কর্মীরা যে গ্রামে যে শহরে যায়, মানুষ সাদরে আহ্বান করে, খেতে দেয়, থাকতে দেয়। আজ যদি আমরা আমাদের নেতাদের, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম ভুলে যাই, বৈপ্লবিক আদর্শকে যদি মনের মধ্যে সর্বদা জ্বলন্ত না রাখি, তবে মানুষের এই ভালবাসা আমাদের কাছে একটা প্রিভিলেজ, একটা সুবিধা হবে। আগামী দিনে সংগঠন আরও বড় হবে, আরও বড় সমাবেশ হবে। সেদিনকার নেতাদেরও জানতে হবে যে, একদিন গুটিকয়েক মহিলা, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কী কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন এই সংগঠনটাকে দাঁড় করাবার জন্য।

সম্মেলনে উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ

কর্মী-সংগঠকদের বুঝতে হবে — দায়িত্ব মানে দায়িত্বই। যে দায়িত্ব নিলাম, তা শেষপর্যন্ত পালন করে যাব। পারব কী পারব না — এ প্রশ্ন তুলব না। সংগঠনের ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে। নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়, নেতৃত্ব মানে দায়িত্ব, নেতা সে-ই যার একটা সুস্পষ্ট নীতি আছে, উন্নত সংস্কৃতি আছে, সকলের কাছ থেকে যে শিখতে পারে। দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই আমার স্বীকৃতি — পদ বা চেয়ারের মধ্যে নয়। আত্মম্ভরিতা মানে আত্মমর্যাদাবোধ নয়। আমি একটা মহৎ আদর্শকে মর্যাদা দিচ্ছি আমার জীবনে-কর্মে-আচরণে — এটাই আমার আত্মমর্যাদা।

আপনারা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছেন। মধ্যবিত্তদের খানিকটা আর্থিক সংস্থান আছে। কিন্তু বৃহত্তর নারীসমাজ আর্থিক দুর্দশার শৃঙ্খলে বাঁধা। তাদের কাছে যেতে হবে। বস্তিবাসী নারী, চটকল- চা-বাগানের নারী — এদের ব্যথা বেদনা বুঝতে হবে। মধ্যবিত্তের মানসিক জটিলতা নিয়ে গেলে চলবে না, তাদের একজন হয়েই যেতে হবে। বস্তিতে, গরিব পাড়ায় থাকতে হবে, মিশতে হবে, তাদের চিন্তাভাবনাকে উপরে তোলবার জন্য। মনুষ্যত্ব আজও যা কিছু বেঁচে আছে, তা ঐ গরিবদের মধ্যে, বস্তিতে আছে। যে মেয়েরা কাজে বের হয়, বাড়িতে বাড়িতে কাজে যায়, শহরে তরকারি বিক্রি করতে আসে, চটকল, চা-বাগানে কাজ করে তারা অনেকটা অগ্রণী হয়, সাহসী হয়। আবার যারা গ্রামে শুধু ঘরের কাজে আটকে আছে, তারা সাধারণত অনেক পিছনে আছে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ঘরের নারীদের সমস্যাও এক নয়। এই জটিলতার মধ্যে আপনাদের ঢুকতে হবে।

ফলে, আজ দেশের সর্বাত্মক সংকটে দেশের গণআন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে, ফরাসি বিপ্লবে নারীরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েই লড়াই করেছিল। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী যখন বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরেছিল, তখন জারের মিলিটারি বন্দুক-কামান নিয়ে হাজির। মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মায়েরা, ঐ সৈন্যদের তারা বলেছে — তোমরা আমাদের সন্তান, এরাও আমাদের সন্তান। এরা শোষণের বিরুদ্ধে সকলের মুক্তির জন্য লড়ছে, তোমরা টাকার বিনিময়ে শোষকের পক্ষে কাজ করছ। তোমরা এদের সাথে হাত মেলাও। তারপরে ঘটল ঐতিহাসিক ঘটনা। মায়েদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সৈন্যরা বিপ্লবীদের সাথে যুক্ত হয়ে জারের বিরুদ্ধে কামান ধরল। চীনে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে লড়াই হয়েছে মহান মাও-এর নেতৃত্বে। যে লালফৌজ পাহাড়ে-জঙ্গলে-গুহায়-নদীপথে হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে লড়াই করেছে, তাদের মধ্যে এক বিরাট নারীবাহিনী ছিল। ভিয়েতনামে ৪০ বছর ধরে ফরাসি-জাপ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা কামান-বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছে। আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে মেয়েদের এই ভূমিকা চাই। আপনাদের সেই জায়গায় আসতে হবে। তার জন্য জ্ঞানের চর্চা, শরীর চর্চা, সংগঠন গড়ে তোলা সবকিছু আপনাদের করতে হবে। এবং সেটা করতে পারলেই একমাত্র নারীমুক্তি আন্দোলনের পক্ষে বিরাট অগ্রগতি হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net